স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাম্পাসে ১৫০ খুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খুন হয়, বিচার হয় না

মোতাহার হোসেন, ঢাবি

প্রকাশিত: ২৩:০৫, ২১ আগস্ট ২০২৪; আপডেট: ২৩:২১, ২১ আগস্ট ২০২৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে সংঘটিত খুনের ন্যায়বিচার পায় না ভুক্তভোগীর পরিবার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে সংঘটিত খুনের ন্যায়বিচার পায় না ভুক্তভোগীর পরিবার। এক যুগ আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু বকর ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন। ওই ঘটনায় আদালতের রায় হলেও বকরের পরিবার বলছে, তারা ন্যায়বিচার পাননি। শুধু আবু বকর নয়, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ পর্যন্ত ঢাবিতে অন্তত ৬৪টি হত্যাকা- হয়েছে। এসব ঘটনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার না পাওয়ার অভিযোগ নিহত শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের।

UNIBOTS

নিহত আবু বকরের পরিবার জানায়, ২০১০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি রাতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হলের মেধাবী শিক্ষার্থী আবু বকর। ২০১৭ সালে এ মামলার রায়ে ছাত্রলীগের সাবেক ১০ নেতা-কর্মী বেকসুর খালাস পান। অথচ রায়ের ব্যাপারে নিহতের পরিবার কিংবা বাদীকে কোনো কিছু জানানো হয়নি। বাদীর পক্ষে সরকারি কৌঁসুলি এই মামলা পরিচালনা করেন।

রায়ের আট মাস পর নিহতের পরিবার ও বাদী এ বিষয়ে জানতে পারেন। আদালতের রায়ে সব আসামি খালাস পাওয়ায় আবু বকরের প্রকৃত খুনিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। মামলায় অপরাধী শনাক্ত করতে না পারার জন্য পুলিশের দুর্বল তদন্তকে দায়ী করেন আদালত। হত্যাকারী চিহ্নিত করার মাধ্যমে বিচার নিশ্চিত করতে উচ্চ আদালতে আপিল করার যে সুযোগ ছিল, তাও রাষ্ট্রপক্ষ নেয়নি। ফলে নিহতের পরিবার বিচার পাওয়ার অধিকার থেকেই বঞ্চিত হয়ে যায়।

ওই ঘটনার পর থেকে সন্তান হত্যার বিচারের দাবিতে আজও কাঁদেন আবু বকরের মা। রহস্যজনক এ মামলায় আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও ঢাবির সাবেক উপাচার্য মো. আখতারুজ্জামান বিচার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বললেও কোনো সুফল আসেনি।

এ বিষয়ে নিহত আবু বকরের ছোট ভাই ওমর ফারুক দৈনিক জনকণ্ঠকে বলেন, ‘আমার ভাই অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী ছিলেন। হত্যার পর ওমর ফারুক নামে একজন বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন। ২০১৭ সালে মামলার রায় হয়। কিন্তু আমাদের জানানো হয়নি। পরে অনেকদিন পর সাংবাদিকের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে মামলার রায় হয়েছে। মামলার রায়ে আমরা খুশি নই। পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে আমরা খুব বেশি এগোতে পারিনি। আমার মা ভাইয়ের ছবি বুকে জড়িয়ে আজও কাঁদে। শুধু আমার ভাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যত হত্যা হয়েছে, ওইসব হত্যার বিচার হওয়া দরকার। আমি আমার ভাই হত্যার বিচার চাই।’

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ পর্যন্ত ঠিক কতগুলো হত্যাকা- ঘটেছে সে সম্পর্কে কোনো নথি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে নেই। তবে, বিভিন্ন নথি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শুধু আবু বকর নয়, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অন্তত ১৫০টি খুন হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৪৬ জন শিক্ষার্থী। স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বেশি খুনের ঘটনা ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৭৪ থেকে এ পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত ৬৪টি হত্যাকা- ঘটেছে। এর মধ্যে ৬০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, চারজন বহিরাগত।

সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রভাব বিস্তার, ছাত্র সংগঠনের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজি, নারী ঘটিত নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে এসব হত্যাকা- সংঘটিত হয়েছে। এসব হত্যাকা-ের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো অপরাধী চূড়ান্ত শাস্তি পায়নি। রাজনৈতিক আশ্রয়ে এসব হত্যাকা- সংঘটিত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত অপরাধীরা বিচারের আওতায় আসেনি। অনেক মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি পলাতক। কিছু মামলার দ-াদেশ পাওয়া আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরলেও পুলিশ তাদের খুঁজে পাচ্ছে না। কিছু মামলা এখনো তদন্তাধীন বলে জানা গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে বহুল আলোচিত হচ্ছে সাত ছাত্র খুনের ঘটনা। যা ১৯৭৪ সালে

৪ এপ্রিল হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে ঘটে। ওইদিন রাতে সূর্যসেন হলের সাত শিক্ষার্থীকে অস্ত্রের মুখে মুহসীন হলের টিভি রুমে নিয়ে স্টেনগান দিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলেই খুনের বিচার হয় এবং চার বছর পর আদালত শফিউল আলম প্রধানকে মৃত্যুদ- দেন। বাকি আসামিদের দেওয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদ-। কিন্তু জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসার পর আসামিরা সবাই ছাড়া পেয়ে যান।

১৯৭৭ সালে প্রেমসংক্রান্ত বিরোধের জেরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ভূতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থী বীরেন্দ্র কুমার সরকারকে হত্যা করে একই হলের শিক্ষার্থী রণজিৎ কুমার মজুমদার। আলোচিত এ হত্যা মামলার ৪৬ বছরেও আসামি গ্রেপ্তার হননি। শেষ হয়নি বীরেন্দ্র হত্যার বিচারও। ১৯৭৭ সালে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে মারা যায় সংগঠনটির শীর্ষ নেতা লুকুসহ দুই কর্মী। একই বছর নুর গ্রুপের ক্যাডারদের হাতে প্রাণ হারায় ছাত্রলীগ নেতা আওরঙ্গের ভাই রন্টু। এছাড়া ওই বছরই খুন হন হনু ও গোপাল নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও দুই শিক্ষার্থী। ১৯৭৮ সালে খুন হন ছাত্রলীগ কর্মী লিয়াকতসহ আরও দুই শিক্ষার্থী।

১৯৮৩ সালে শিক্ষার্থী ও পুলিশ সংঘর্ষে নিহত হয় সাধারণ শিক্ষার্থী জয়নাল। ১৯৮৫ সালে মুহসীন হলের সামনে ছাত্র সমাজের ক্যাডারদের গুলিতে নিহত হন স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সামনে থেকে নেতৃত্বদানকারী অন্যতম নেতা রাউফুন বাসুনিয়া।

১৯৮৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে মারা যায় আসলাম নামের এক শিক্ষার্থী। ১৯৮৭ সালে মুহসীন হলে বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক বাবলু এবং তার দুই সহযোগী মইনুদ্দীন ও নূর মোহাম্মদ। ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে খুন হন বজলুর রশিদ নামে এক শিক্ষার্থী। ঠিক তার পরের দিনই ছাত্রলীগ (জাসদ)- ছাত্রদল সংঘর্ষে নিহত হন ছাত্রদল কর্মী হালিম।

১৯৮৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ঢাবির মধুর ক্যান্টিনের সামনে ছাত্রদলের সঙ্গে গোলাগুলিতে নিহত হন ছাত্রলীগ (জাসদ) কর্মী কফিল উদ্দিন। একই বছর ২৯ ডিসেম্বর ফিন্যান্স বিভাগের আরিফ নামের এক শিক্ষার্থীকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বরে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের উত্তাল সময়ে স্বৈরশাসকের লেলিয়ে দেওয়া সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন ডা. শামসুল আলম খান মিলন।

ওই বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ নেতা চুন্নুর সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণে খুন হন সূর্যসেন হলের শিক্ষার্থী আলমগীর কবীর। এছাড়া একই বছর সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন হাজী মুহম্মদ মহসীন হলের এক ছাত্রলীগ (জাসদ) কর্মী। সেইদিনই ফজলুল হক হলের ডরমেটরি থেকে উদ্ধার করা হয় শাহীন নামে আরেক শিক্ষার্থীর লাশ।

১৯৯১ সালের ২০ জুন ঢাবি ল্যাবরেটরি স্কুলের সামনে খুন হন মাহবুবুর রহমান। একই বছর ২৭ অক্টোবর ক্যাম্পাসে খুন হন তিন বহিরাগত শিক্ষার্থী গালিব, লিটন ও মিজান।

১৯৯২ সালের ১৩ মার্চ ক্যাম্পাসে প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের কর্মীদের গুলিতে খুন হন ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মঈন হোসেন রাজু। একই বছর ৪ সেপ্টেম্বর দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে খুন হন দুই ছাত্রদল নেতা আশরাফুল আজম মামুন ও খন্দকার মাহমুদ হোসেন। ১৯৯২ সালের ৯ জানুয়ারি শামসুন্নাহার হলের সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান তৎকালীন ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান বাদল। একই বছর ১১ জুলাই কার্জন হলের সামনে খুন হন ছাত্রলীগ কর্মী তন্ময়।

১৯৯৩ সালে এক সংঘর্ষে প্রাণ হারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই কর্মচারীসহ জিন্নাহ নামের এক শিক্ষার্থী। একই বছর ২২ নভেম্বর গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র অলক কান্তি পাল।

১৯৯৪ সালে ছাত্রলীগের অন্তর্কোন্দলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় সংগঠনের কর্মী বুলবুল। একই বছরে ছাত্র দলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত হয় সরোয়ার হোসেন মিঠু নামে আরেক শিক্ষার্থী। এছাড়া ২৭ অক্টোবর আরেক শিক্ষার্থী জগন্নাথ হলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। ওই বছরে ফজলুল হক হল থেকে গণিত বিভাগের প্রথম বর্ষের এক শিক্ষার্থীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

১৯৯৬ সালে ছাত্রলীগের অন্তর্কোন্দলে সংঘর্ষে মারা যায় জগন্নাথ হলের এক সাধারণ ছাত্র। ১৯৯৭ সালে ছাত্রদলের অন্তর্কোন্দলে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান বঙ্গবন্ধু হলের শিক্ষার্থী আরিফ। এছাড়া কার্জন হল থেকে সে সময় উদ্ধার করা হয় শাহিন নামে আরেক ছাত্রের মৃতদেহ।

১৯৯৮ সালে প্রাণ হারান ছাত্রলীগ নেতা পার্থ প্রতিম আচার্য। একই বছর দলীয় কোন্দলের জেরে খুন হন ছাত্রলীগের জগন্নাথ হল শাখার এক শিক্ষার্থী। ভিন্ন ঘটনায় ১৯৯৯ সালে খুন হন মনির হোসাইন ও ফিরোজ নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী। ২০০০ সালের ১ জানুয়ারি ক্যাম্পাসে ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে নিহত হন এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব নিকুঞ্জ বিহারী নাগ।

২০০৩ সালের ২৫ ডিসেম্বর মোহসিন হলের বসুনিয়া গেটের সামনে মোহাম্মদপুর থেকে অপহৃত ইয়াসমিন ও ইসমাইল নামে দুই ব্যবসায়ীর লাশ পাওয়া যায়। ২০০৪ সালের ১৭ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনের গ্যারেজ থেকে উদ্ধার করা হয় এলিফ্যান্ট রোডের চিহ্নিত সন্ত্রাসী শামসুর লাশ।

এদিকে, এসব হত্যাকা-ের অধিকাংশ ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীদের দ্বারা সম্পন্ন হলেও এসবের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিচার দাবি করেছেন ছাত্র সংগঠনের বর্তমান নেতাকর্মীরা। তারা জানান, রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে এসব হত্যাকা- সংগঠিত হওয়ায় অপরাধীদের বিচার হয় না। এসব হত্যাকা-ের বিচার না হওয়ার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করে বলে দাবি তাদের।

এ বিষয়ে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি সালমান সিদ্দিকী দৈনিক জনকণ্ঠকে বলেন, শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সন্ত্রাস ও দখলদারিত্বের পরিবেশ বজায় এবং যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে ক্যাম্পাসগুলোতে তাদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য মূলত এসব হত্যাকা- ঘটে। কখনো বিএনপি, কখনো আওয়ামী লীগ কখনো স্বৈরাচার এরশাদ সরকার যাদের কথাই বলি সত্যিকার অর্থে কোনো সরকার কখনো ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে চায়নি।

যার ফলে এসব হত্যাকা-ের বিচার কখনো হয় না। পরবর্তী সময়ে বিরোধী দল সরকারে আসার পরেও এসব হত্যাকা-ের বিচার হয়নি। কারণ যখন যে ক্ষমতায় এসেছে তখন তারাই সন্ত্রাস ও দখলদারিত্বের একটি পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করেছে।

তিনি আরও বলেন, ‘এসব হত্যাকা-ের বিচার না করায় যারা এসব ঘটনায় যুক্ত তাদের কাছে একটি মেসেজ পৌঁছায় যে সন্ত্রাস ও দখলদারিত্ব রক্ষায় তোমরা বিরোধী দলের যে কাউকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারো। কিন্তু বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোর মধ্যে যদি আমরা হত্যাকা-ের ঘটনা কমাতে চাই তাহলে আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যদি আমরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে পারি তাহলে অপরাধ প্রবণতা কমে যাবে। কিন্তু অতীতে এসব হত্যাকা-ের সঙ্গে যারা জড়িত তাদের রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। মামলা পর্যন্ত নেওয়া হয়নি এমন ঘটনা ঘটেছে।’

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দীন নাসির বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মাত্রাতিরিক্ত দলীয়করণের কারণে ন্যায়সঙ্গত কোনো সিদ্ধান্তে তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াতে পারে না। যদি বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতো তাহলে এ সকল হত্যাকা- ঘটতো না। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আমি সকল হত্যাকা-ের ন্যায়বিচার দাবি করছি।’